k×vÄwj

নক্ষত্রের আগুন ভরা রাতে

জসিম মল্লিক

১৯৮০ সাল। বরিশাল কলেজে পড়ি। পত্রপত্রিকা, গল্পের বইয়ের প্রতি একটা ঝোঁক তখন থেকেই। বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরিতে যাই মাঝে মঝে বই আনতে। আমার এক চাচি ছিলেন খুব বইয়ের পোকা। তার জন্যই মূলত বই আনতে যেতাম আমি। ওখান থেকেই বইয়ের প্রতি ঝোঁক বাড়ে।

বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরিতেই আমি প্রথম বিচিত্রা পত্রিকাটা দেখি। দু'একটা সংখ্যা পড়ে আমার এমন ভালো লেগে গেল যে, বিচিত্রার পাঠকের পাতায় আমি কয়েকটা চিঠি পাঠালাম, জানতাম না যে ছাপা হবে। কিন্তু আমাকে আশ্চর্য করে দিয়ে একদিন একটা চিঠি ছাপা হয়ে গেল। ছাপা অক্ষরে আমার নাম দেখে আমি খুব খুশি হলাম। সেই থেকে শুরু। তখন বিচিত্রার দাম মাত্র ৫০ পয়সা। মা আমাকে স্কুলের টিফিনের জন্য যে পয়সা দিতেন সেটা দিয়ে আমি পত্রিকা কিনতাম। এরপর আমি অন্যান্য পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে নিয়মিত লিখতে থাকি এবং সেগুলো ছাপাও হয়। যেমন আমি লিখতাম দৈনিক বাংলা, সংবাদ, ইত্তেফাক, চিত্রালী, পূর্বাণী, বেগম, ঝিনুক ইত্যাদি পত্রিকায়।

বিচিত্রার ব্যাক্তিগত বিজ্ঞাপন বিভাগটি তখন খুবই জনপ্রিয়। প্রতি শব্দ ৫০ পয়সা দিয়ে বিজ্ঞাপন দেয়া একটি অভাবনীয় ব্যাপার মনে হলো আমার কাছে। আমি একদিন সত্যি সত্যি বিজ্ঞাপন দিতে শুরু করলাম। ফলাফল হলো অপ্রত্যাশিত। আমি প্রচুর চিঠি পেতে শুরু করলাম। এর আগেও চিঠি পেতাম কিন্তু বিচিত্রার ফলাফল অভাবনীয়। এক পর্যায়ে আমার অসংখ্য পত্রবন্ধু হয়েছিল এবং তা টিকেছিল অনেক দিন পর্যন্ত। তো ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন তখন সত্যি একটা আলাদা মাত্রা যোগ হলো, বিশেষ করে তরুণ তরুণীদের মধ্যে। পয়সার বিনিময়ে মনের অব্যক্ত কথা প্রকাশ করার এক আশ্চর্য মাধ্যম হয়ে উঠলো বিচিত্রা। আমি তখন এত চিঠি পেতাম এবং লিখতাম যে, ডাক বিভাগ কর্তৃপক্ষ আমার জন্য একটা সাব পোস্ট অফিস খুলেছিল।

একদিন ঢাকা পাড়ি জমালাম। মনে মনে উদ্দেশ্য, বিচিত্রার সাথে যোগসূত্র গড়ে তোলা এবং বড় বড় লেখকদের সামনাসামনি দেখা। কিন্তু কীভাবে সেটাই জানি না। ব্যক্তিগতভাবে আমি একটু অন্তর্মুখী টাইপের। নিজেকে তুলে ধরার কোনো কায়দা-কানুনই জানি না। আজও না।

দুই.

একদিন ঢাকা পাড়ি জমালাম। মনে মনে উদ্দেশ্য, বিচিত্রার সাথে যোগসূত্র গড়ে তোলা এবং বড় বড় লেখকদের সামনাসামনি দেখা। কিন্তু কীভাবে সেটাই জানি না। ব্যক্তিগতভাবে আমি একটু অন্তর্মুখী টাইপের। নিজেকে তুলে ধরার কোনো কায়দা-কানুনই জানি না। আজও না।

তো একদিন দোয়া দরুদ পড়ে বিচিত্রা অফিসে গেলাম দৈনিক বাংলার দোতলায়। বিখ্যাত ১, ডি আইটি এভিনিউ। অতি পুরাতন লিফট। উঠতে ভয় করে। তো প্রথম দিন বিচিত্রার পিয়ন মুনির ভাই পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছিলাম। পরবর্তীতে দেখেছি মুনির ভাই কত দাপটের ছিলেন। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট জিয়া মুনির ভাইকে নামে চিনতেন বলে শুনেছি। মুনির ভাইকে খুশি করতে পারলে অর্ধেক কাজ হয়ে যেতো।

এও শুনেছি, অনেক লেখকই নাকি দৈনিক বাংলা ভবনের আশপাশে ঘুরতেন। একবার যদি ওখানে পা রাখা যায়। একবার যদি লেখা ছাপানো যায়! অনেকেই বিচিত্রায় লেখা ছাপা না হলে নিজেদের লেখক ভাবতেই সাহস পেতেন না। বিচিত্রার তখন এমনই দাপট। আর যারা ওই পত্রিকায় লিখতেন, সাহসী সব রিপোর্ট করতেন, তারা না জানি কেমন মানুষ। সম্পাদকের কাছে পর্যন্ত যাওয়া তো অনেক পরের ব্যাপার। তখন বিচিত্রায় চাকরি করতেন শাহরিয়ার কবির, চিন্ময় মুৎসুদ্দী, কাজী জাওয়াদ, মাহমুদ শফিক, মাহফুজুল্লাহ, আলমগীর রহমান, শামসুল ইসলাম আলমাজীর মতো সব জায়ান্টরা।

তো ওইরকম একটা কঠিন জায়গায় আমার মতো সদ্য মফস্বল থেকে আসা তরুণের ঢুকতে চাওয়া একটু বাড়াবাড়ি না! আর এই শহরে এ লাইনে আমার কেউ নেইও যে, আমার কথা কেউ সুপারিশ করবে। আমার চৌদ্দ গোষ্ঠীর মধ্যে কেউ লেখালেখিও করে না। আমার একটাই ভরসা ছিল বিচিত্রায় আমি গন্ডা গন্ডা চিঠি পাঠাই এবং প্রায়ই তা ছাপা হয়। তো মুনির ভাইকে আমার নাম বলতেই চিনে ফেললেন এবং বললেন, আপনাকে শামীম আপা খুঁজছেন। আমি আমতা আমতা করে বললাম, তিনি কে? মুনির ভাই বললেন, শামীম আজাদকে চেনেন না! আজকেই যান দেখা করে আসেন বাসায়। আমার তখনও ধারণা ছিল শামীম আজাদ পুরুষ।

শামীম আজাদের ধানমন্ডি পনেরো নম্বরের বাসায় গেলাম দেখা করতে। বোঝা যায় বেশ বড়লোক। তিনি তখন বিচিত্রার জীবন এখন যেমন বিভাগের বিভাগীয় সম্পাদক। আমি তার বিভাগে লিখতাম বরিশাল থেকে। তিনিই আমাকে প্রথম বিচিত্রায় লিখতে বললেন এবং বিচিত্রা অফিসে নিয়মিত আসতে বললেন। আমি তখনও জানি না ঢাকায় থাকবো কিনা। তার এক কথায় আমি ঢাকায় থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। ভর্তি হলাম ঢাকা

ইউনিভার্সিটিতে। শুরু হলো নতুন এক সংগ্রামী জীবন।

তিন.

প্রথম দিন বিচিত্রা অফিসে ঢুকে একজন কালো মতো যুবককে দেখলাম পিন দিয়ে পেপার কেটে নিউজপ্রিন্টে গাঁথছে। এই মানুষটি হচ্ছে ইরাজ আহমেদ। দৈনিক বাংলার ডাকসাইটে সম্পাদক আহমদ হুমায়ূনের ছেলে। সে তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র এবং বিচিত্রার কন্ট্রিবিউটার। এটাই ছিল বিচিত্রার নিয়ম। কন্ট্রিবিউটাররা কাজ শিখবে, পড়াশুনা শেষে যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারলে চাকরি হবে। ইরাজ সেদিন আমাকে দৈনিক বাংলার বিখ্যাত চা খাইয়েছিল। কালো চা।

১৯৮৩ সালের শেষ দিকের কথা। তখন আর এক যুবককে দেখলাম, তিনি আরিফ রহমান শিবলী। পরবর্তীতে আরো কাজ করেছে ফয়জুল আহসান শামীম, মাহফুজুর রহমান, মালিক আল ইমরান এরা। সবাই পার্টটাইমার। ছাত্র।

১৯৮৪ সালে প্রথম বিচিত্রা ঈদ ফ্যাশন প্রতিযোগিতা শুরু হলো শামীম আপার নেতৃত্বে। আমি, শিবলী এবং করভী মিজানকে নিয়ে এই টিম। করভী তখন আঠারো বছরের এক তরুণী এবং গাড়ি ড্রাইভ করে। ১৯৮৬ সালে বিচিত্রায় এলেন মঈনুল আহসান সাবের, মিনার মাহমুদ। নিয়মিত লেখক হিসেবে ইরাজ, শামীম, মাহফুজ, শিবলীর নাম প্রিন্টার্স লাইনে ছাপা হলো। বিচিত্রার প্রিন্টার্স লাইন বিরাট বড় কিছু। সেবার আমার নাম ছাপা না হওয়ায় মিনার ভাইকে দুঃখ করে বললাম, মনে হচ্ছে পৃথিবীটা ওলট-পালট হয়ে গেছে।

শামীম আপা ছাড়া আমার হয়ে কথা বলার তখন কেউ ছিল না। সম্পাদকের কাছে কথা পৌঁছানো অত সহজ ছিল না। আমি নিজে চেষ্টা করিনি কখনো। সাহসও পাইনি। অবশেষে ১৯৯৮ সালে আমার ও এমদাদ হকের নাম বিচিত্রার প্রিন্টার্স লাইনে শোভা পেলো। এমদাদ ও শামীম আপা ফ্যাশন টিমের অন্যতম সদস্য হলেন। প্রায় চৌদ্দ বছর বিচিত্রার সাথে জড়িত থাকাকালে অনেক প্রতিভাবান রিপোর্টার এসেছেন। এদের মধ্যে মিনার মাহমুদ, আসিফ নজরুল, আশরাফ কায়সার, সেলিম ওমরাও খান, মিজানুর রহমান খান এদের নাম উল্লেখ করা যায়।

কন্ট্রিবিউটাররাও ছিলেন প্রতিভাবান। যেমন আনোয়ার শাহাদত, ফারিয়া হোসেন প্রমুখ। এছাড়াও বিচিত্রার শেষ পর্যায়ে এসেছিলেন মোহসিউল আদনান, গোলাম মোর্তোজা আরো অনেকে। এদের বাইরেও অনেক বিশিষ্ট্য লেখক, সাংবাদিকরা বিচিত্রায় লিখতেন। এরা ছিলেন অতিথি লেখক। এই দীর্ঘদিন গুলোতে অনেকের আসা-যাওয়াই দেখেছি। এরপর বিচিত্রার যুগ শেষ হলো আকস্মিক। ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে দৈনিক বাংলা ট্রাস্ট বন্ধ করে দিলেন।

চার.

এরপর সাপ্তাহিক ২০০০-এর যুগ। একঝাঁক তরুণ নিয়ে ১৯৯৮ সালে শুরু হলো এর সাহসী যাত্রা। মিডিয়া ওয়ার্ল্ডের আর একটি প্রকাশনা। মাত্র কয়েকজন তরুণকে সাথে নিয়ে পরিকল্পনা চলছিল পত্রিকা প্রকাশনার। আমাদের প্রাণপ্রিয় সম্পাদক শাহাদত চৌধুরী। আমার দৃষ্টিতে তিনি এক অসম্ভম আধুনিক ও সাহসী মানুষ ছিলেন। তার সম্পর্কে অল্প কথায় কিছু বলা আমার পক্ষে সত্যি কঠিন। অনেক টুকরো টুকরো স্মৃতি তো আছেই। শেষবার তার সাথে দেখা হয় ২৬ জুন ২০০৩ সালে। ২০০০ অফিসে আমি সপরিবারে এসেছিলাম আমার কানাডা আসার দু'দিন আগে। সেটা ছিল আমার বিদায় অনুষ্ঠান। শাহাদত ভাইকে সেদিন বেশ আবেগপ্রবণ দেখেছি। সত্যি বলতে কি সময়ের হিসাবে প্রায় ২৩টি বছর তার সাথে আমার পার হয়েছে। এরপর আর তাকে দেখিনি, আর কখনো দেখবো না। ২০০৪ সালে যখন নিউইয়র্ক এসেছিলেন তখন আমার খুব যাওয়ার ইচ্ছা ছিল দেখা করতে। কিন্তু শাহাদত ভাই বললেন, টরন্টোয় নতুন এসেছো এখন আসতে হবে না। আমিই আসবো কানাডা একবার। শাহাদত ভাইর আর কানাডা আসা হলো না। যিনি সারা পৃথিবী ঘুরেছেন তিনি আর কোথাও যাবেন না। যখনই ফোন করতাম খুব খুশি হয়েছেন। শেষের দিকে দু'একবার কথা বলতে পারিনি অসুস্থতার কারণে। কারণ কথা বলা ছিল নিষেধ। সব সময় বলতেন কিরণকে বলো বেশি বেশি লিখতে, পিয়ালের সাথে যোগাযোগ রাখবে, ইমিগ্রেশন নিয়ে বেশি বেশি লিখতে বলতেন। কানাডার হাইকমিশনার যখন আসেন দায়িত্বে তখন শাহাদত ভাই নিউইয়র্কে। হাইকমিশনার আমার কথা বলেছিলেন। আর আমাদের হয়ে কথা বলবেন না তিনি। প্রবাসে আমরা কতটা একা হয়ে গেলাম।

২৮ নবেম্বর রাত দশটা। লসএঞ্জেল থেকে পিয়ালের ফোন। জসিম ভাই একটা খারাপ খবর আছে। আমি খুব চমকে উঠি। পিয়ালের কান্নাভেজা কণ্ঠই আমাকে বার্তা পৌঁছে দেয়। আমার হাত থেকে ফোনটা পড়ে যেতে চায়। দু'দিন আগেও আমি শাহাদত ভাইকে স্বপ্নে দেখেছি। হাস্যোজ্জ্বল শাহাদত ভাই খুব হেসে হেসে গল্প করছেন শহিদুল্লাহ খান বাদল ভাইয়ের সাথে। আকবর হায়দার কিরণকে ফোন করি, সে আগেই শুনেছে, কিরণ ভাই জ্যাকসন হাইটসের রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদছেন। লন্ডনে শামীম আপা কাঁদেন, অটোয়ায় ফারুক ফয়সাল বিষণ্ন এক লেখা লেখেন তার ওয়েবসাইটে। নিউইয়র্কে মিনার মাহমুদ তার অনেক স্মৃতির কথা বলেন, বিল্টু ভাই কাঁদেন। ফোন করি ডিজিটাল ওয়ানের জিকুকে। সান্ত্বনা পাই না। শাহাদত চৌধুরী নেই, এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন আমাদের জন্য।

জীবানন্দের ভাষায় বলতে হয়-

'আমি চলে যাব, তবু সমুদ্রের ভাষা
র'য়ে যাবে, তোমার পিপাসা
ফুরাবে না, পৃথিবীর ধুলো, মাটি তৃণ
রহিবে তোমার তরে, রাত্রি আর দিন।
র'য়ে যাবে, র'য়ে যাবে তোমার শরীর-
আর এই পৃথিবীর মানুষের ভীড়।'

Toronto
Jasim_mallik@hotmail.com

'বিদায় রানা'

আসজাদুল কিবরিয়া

যখন থেকে বানান করে বাংলা কঠিন শব্দগুলো পড়তে পারি, তখন থেকেই আমার কাছে 'বিচিত্রা' ছিল এক আশ্চর্য আকর্ষণ। পাতা উল্টে টোকাইর কার্টুনসহ বিভিন্ন বিজ্ঞাপনী কার্টুন (যেমন আলাউদ্দিন মিষ্টি) ছাড়া অবশ্য আর কিছু পড়া বা বোঝার বয়স তখন হয়নি। এখনও বেশ মনে পড়ে, বিচিত্রার একটা প্রচ্ছদ হয়েছিল 'ঈদের বাজারে টোকাই' যেখানে প্রায় পুরো সংখ্যাটাই ছিল রনবী'র টোকাইর কার্টুন দিয়ে সাজানো। উপরের ক্লাসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে 'বিচিত্রা'-র দু'একটা লেখা পড়ার চেষ্টা শুরু। ঈদের সময় মোটাসোটা একটা 'বিচিত্রা' হাতে নিয়ে

পড়ার চেষ্টা ঠিক কবে থেকে শুরু করেছিলাম তা খেয়াল নেই, তবে ঐ সময় থেকেই নিজের নাম ছাপার হরফে দেখার একটা বাসনা জেগে উঠেছিল ঐ ঈদ সংখ্যায়। তখন থেকেই আমার ও আমার ছোটবোনের কাছে 'বিচিত্রা'র মানুষগুলো একটা ভিন্ন জগতের মানুষ বলে মনে হতো। প্রায় একই সময়ে আমাদের জন্য নিষিদ্ধ প্রজাপতির প্রতীক সম্বলিত বাংলা পেপারব্যাকের জগতে বিচরণ আরম্ভ হয়। বইয়ের আলমারি থেকে চুরি করে 'মাসুদ রানা' হাতে তুলে নেয়ার অল্পকালের মধ্যে যখন 'রহস্য পত্রিকা' হাতে এলো, তখন মনে হলো এইতো আমার জগৎ। এভাবে স্কুলের গন্ডি পেরুনোর আগেই আমাদের স্বপ্ন দেখা শুরু, একই সঙ্গে শুরু স্বপ্নের ফেরিওয়ালাদের একনজর দেখার, একবার কাছে যাওয়ার আকাঙ্খা। তখন কি জানতাম, একদিন সুযোগ আসবে সত্যিই এদের কাছে যাওয়ার, এদের সঙ্গে কাজ করার?

২.

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় বাংলা ১৪০০ সাল উদযাপন উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জে আমাদের সুধীজন পাঠাগার থেকে প্রকাশিত হলো 'বাংলা সংস্কৃতির শতবর্ষ' গ্রন্থটি। এর ওপর একটি আলোচনা লিখে দুঃসাহস করে চলে গেলাম দৈনিক বাংলা ভবনে বিচিত্রা অফিসে। শিকদার ভাই (আবদুল হাই শিকদার) পূর্ব পরিচিত থাকায় তার সহযোগিতায় সাবের ভাইর (মঈনুল আহসান সাবের) হাতে বইসহ লেখাটি তুলে দিলাম। সেই শুরু হলো যাতায়াত। আলোচনাটি ছাপা হওয়ার পর উৎসাহ বেড়ে গেল। সাবের ভাই ছোট-খাটো কিছু লেখার কাজ দিতে লাগলেন। তখন পর্যন্ত 'বিচিত্রা'র প্রাণ-পুরুষ শাহাদত চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। একই সময়ে মোর্তোজা (গোলাম মোর্তোজা) লেখালেখি আরম্ভ করে বিচিত্রায়। ও মূলত বিভিন্ন প্রতিবেদনের কাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়। ১৯৯৭ সালে সরকারি নির্দেশে 'বিচিত্রা' বন্ধ হয়ে যাওয়ার কিছুদিন আগে শাহাদত ভাই প্রথম আমাকে একটা অর্থনীতির এসাইনমেন্ট দিয়েছিলেন। ঐ পর্ব পর্যন্তই। খুব বেশি কথা বলার বা ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগ হয়নি। পাইপ হাতে হাসিমুখে শাহাদত ভাই অফিসে ঢুকছেন, এই দৃশ্যটি এখনও চোখে ভাসে। তবে সড়ক দুর্ঘটনায় ডায়নার মৃত্যুর পর শাহাদত ভাইর শোকাহত অবস্থা দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম।

৩.

সাপ্তাহিক ২০০০-এর কাজ আরম্ভ হওয়ার খবরটি আমাকে মোর্তোজাই দিয়েছিল। ধানমন্ডিতে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের পুরোনো অফিস কিছুদিন বসার পর ইস্কাটনের অফিসে পুরোদমে কাজ শুরু হলো। বেশ মনে পড়ে, ২০০০-এর অভিনব বিজ্ঞাপন পরিকল্পনা করেছিলেন শাহাদত ভাই। দোতলায় মন্টি ভাই (মিজানর রহমান খান), খসরু ভাই (খসরু চৌধুরী), মোর্তোজাসহ আমরা কয়েকজন আড্ডা দিচ্ছিলাম। শাহাদত ভাই এসে বসলেন। হাতে রনবীর আঁকা টোকাইর একটা কার্টুন। 'প্রথমদিন যাবে টোকাইর একটা হারানো বিজ্ঞপ্তি', শাহাদত ভাই বলতে আরম্ভ করলেন। 'পরের দিনেরটায় থাকবে পাইপের ভেতরে উপুড় হয়ে শুয়ে টোকাইর কথা, 'আমারে খুজে ক্যা'।' শাহাদত ভাই গালে হাত দিয়ে টোকাইর ভঙ্গীতে কথাটা বললেন। বিজ্ঞাপনটি খুব সাড়া ফেলেছিল।

শাহাদত ভাই অসম্ভব সৃজনশীল চিন্তা করতেন। আড্ডার আসর থেকে বের করে আনতেন হরেক রকম আইডিয়া। ২০০০-এর শুরু হওয়ার সময় আমাকে একদিন বলেছিলেন, 'চেষ্টা করবে, ইকোনমিকসের হার্ড নিউজ করতে।' মাঝে মধ্যেই বলতেন, 'অনেকেই এসে রাজনীতি নিয়ে লিখতে চায়, কারণ, এতে আর কিছু না পারলেও গাল-মন্দ করা যায়। কিন্তু অর্থনীতি নিয়ে লিখতে হলে জানতে-বুঝতে-পড়তে হবে। খেলা নিয়ে লিখতে হলেও ভাসা ভাসা জ্ঞান দিয়ে চলবে না।'

২০০০-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকেই প্রথম আলোতে যোগদান করি। চার বছর দু'মাস পরে চলে আসি নিউ এজে। ঐ সময় শাহাদত ভাই আমাকে খবু উৎসাহ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'খাটাখাটি করে মন দিয়ে কাজ কোরো। তুমি ভাল করতে পারবে।'
শাহাদত ভাই ছিলেন প্রাণপ্রাচুর্য ভরা এক মানুষ। ২০০০-এর প্রথম নৌ-বিহারে তিনি প্রায় একাই আসর মাতিয়ে রেখেছিলেন। অসম্ভব স্নেহ করতেন আমার ছোটবোনকে। ও ২০০০-এর কয়েকটি ফ্যাশন সংখ্যায় কাজ করেছিল।

৪.

'কিবরিয়া,' মোবাইলে শাহাদত ভাইর কণ্ঠস্বর।

'জি শাহাদত ভাই, স্লামালাইকুম।'

'কাজী আনোয়ার ফোন করেছিল। শোনো, আমি ওর ওখানে যাব। জলদি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে ফেল।'

তৎক্ষণাৎ সেবা প্রকাশনীতে টেলিফোন করে কাজীদা'র সঙ্গে কথা বললাম। উনি সময় দিয়ে দিলেন। এটা ২০০৫ সালের মে মাসের ঘটনা। তারিখটা মনে নেই।

নির্ধারিত দিন সকালে সেবা প্রকাশনীতে পৌঁছতে না পৌঁছতেই শাহাদত ভাইর ফোন। 'আমি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কাছে, তুমি কোথায়?'

সেগুন বাগিচায় পুরোনো বাড়িটার সামনে গাড়ি থেকে নামলেন শাহাদত ভাই। অসুস্থতা কাটিয়ে উঠলেও শরীর যথেষ্ট দুর্বল। লিফট করে তাঁকে নিয়ে তিনতলায় কাজীদার ঘরে ঢুকলাম। বহুদিন পরে দেখা দুই সুহৃদ পরস্পরকে হৃদয়ের উত্তাপ ঢেলে আলিঙ্গন করলেন। তারপর হারিয়ে গেলেন স্মৃতির সৈকতে। আমি প্রত্যক্ষ করলাম আমার স্বপ্নের ফেরিওয়ালাদের অনেক আনন্দ-বেদনার জানা-অজানা গাথা।

শাহাদত ভাই সেবা প্রকাশনীর অনেকগুলো বইয়ের প্রচ্ছদ করেছেন। লিখেছেন 'কায়রো', 'মৃত্যু প্রহর', 'মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র,'সহ কয়েকটি মাসুদ রানা। 'মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র' সম্ভবত প্রথম বাংলা গ্রন্থ যেখানে ক্যাবারে স্ট্রিপটিজ ডান্সের বিবরণ তুলে আনা হয়। তবে তাঁর সেরা লেখাটি হলো, দুই খন্ডে লেখা 'হ্যালো, সোহানা'। মাসুদ রানার সবচেয়ে রোমান্টিক বই। অ্যাডভেঞ্চার, থ্রিলার আর সাসপেন্সের পাশাপাশি আবেগঘন রোমান্টিসিজম একধারে পাঠকের প্রশংসা ও সমালোচনা কুড়িয়েছে। 'হ্যালো সোহানা' দিয়েই প্রতিষ্ঠা করে দেয়া হলো রানা-সোহানা চিরন্তন জুটি। চমৎকার কোলাজ প্রচ্ছদ করেছিলেন শাহাদত ভাই নিজেই।

'একদিকে কাজী অর্ধেক ফর্মা নিয়ে বসে আছে আর আমাকে ফোনে বলছে, 'আরে লেখার বাকি অংশ কই?' অন্যদিকে আমি ম্যাপ আর বই নিয়ে বসে মিলাচ্ছি, যেসব জায়গার বিবরণ দিয়েছি তা ঠিক আছে কি না,' বলতে বলতে শাহাদত ভাইর আবেগী কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো।

'আপনার চিন্তার গতি যে অনেক দ্রুত তা আমি আপনার লেখা দেখে ভালভাবে বুঝতে পারি,' এক প্রসঙ্গে কাজীদা বললেন। তারপর আমাকে বললেন, 'বুঝলে, শাহাদত লিখছে ঠিকই কিন্তু শব্দ বাদ পড়ে যাচ্ছে। আসলে ও দ্রুত চিন্তা করতো, ফলে যে শব্দটা ভেবেছে সেটা কিছু জায়গায় আর আসছে না।'

দু'জনের কথোপকথনের মাঝখানে বসে আমি ভাবতে আরম্ভ করলাম, শাহাদত ভাইতো মাসুদ রানা! সেই দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা যিনি অস্ত্র হাতে '৭১-এ লড়াই করেছেন। তারপর স্বাধীন বাংলাদেশে কলম নিয়ে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত লড়ে গেছেন অপশক্তি আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে। তরুণ প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, লড়াই করতে, দেশকে ভালবাসতে, ভালবেসে কাজ করতে।

শাহাদত ভাইর করা বিভিন্ন প্রচ্ছদের মধ্যে কাজীদা'র সবচেয়ে ভাললাগার অন্যতম হলো 'বিদায় রানা'-র প্রচ্ছদ যেখানে একটি ছায়ার মধ্যে রানার চলে যাওয়ার ট্র্যাজিক দৃশ্যপট ফুটিয়ে তুলেছিলেন শাহাদত ভাই। মাসুদ রানার সেই বইগুলো সযত্নে রক্ষিত আছে কাজীদা'র লাইব্রেরিতে। নেই শাহাদত ভাই। আর কখনোই কেউ টেলিফোনে তাঁর কণ্ঠস্বরে শুনতে পারবে না, 'হ্যালো, সোহানা।' তার আগেই যে কান্নাভেজা কণ্ঠে আমাকেই বলতে হয়েছে, 'বিদায় রানা।'

আমৃত্যু মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন...

মীর মুর্ত্তজা আলী বাবু

ছিয়াত্তর সালে কলেজে পড়ার সময় আমরা যখন একটু-আধটু লেখালেখি, সাংস্কৃতিক চর্চা, সাংবাদিকতা শুরু করি; তখন শাহাদত চৌধুরীর 'বিচিত্রা' ছিলো আমাদের আদর্শ। বিচিত্রার নিয়মিত পাঠক ও ভক্ত ছিলাম আমরা। মনে আছে, সে সময় কুষ্টিয়ার বহুল প্রচারিত 'সাপ্তাহিক ইস্পাত' পত্রিকার জনৈক আশিকমাহমুদ 'বিচিত্রা'র বিরুদ্ধে অশ্লীলতা এবং নানা রকম অভিযোগ এনে একটি সমালোচনামূলক নিবন্ধন লিখেছিলেন। বিচিত্রার একজন পাঠক হিসেবে আমি তার প্রতিবাদ করে, তাঁর প্রতিটি অভিযোগের জবাব দিয়ে একটি দীর্ঘ লেখা সাপ্তাহিক ইস্পাত পত্রিকায় পাঠিয়েছিলাম। আমার লেখাটি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে 'ইস্পাত'-এ ছাপা হয়েছিল। ভক্ত থেকে ক্রমান্বয়ে বিচিত্রার সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছিলাম। বিচিত্রা পাঠক ফোরামের সক্রিয় সদস্য ছিলাম। ঢাকায় একবার বিচিত্রা পাঠক ফোরামের সভায় গিয়ে শাহাদত চৌধুরীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল। পরে আরো অনেকবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে। সেই থেকে বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি বিচিত্রার নিয়মিত পাঠক ছিলাম এবং শাহাদত চৌধুরীর ভক্ত।

বিচিত্রার প্রতি আমার আকৃষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ হলো, বিচিত্রা আপাদমস্তক একজন কলম মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কাজ করতো। মুক্তিযুদ্ধের সময় অল্পবয়সী বালক হওয়ার কারণে আমি নিজে যুদ্ধ করতে পারিনি। কিন্তু প্রত্যক্ষ করেছি, একাত্তর সালের নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ। দেখেছি পাক হায়েনা আর জানোয়ার রাজাকার, আলবদরদের অত্যাচার। মুক্তিযোদ্ধা সন্তানের মা হওয়ার কারণে রাজাকারদের কটুকথা প্রায়ই আমার মাকে শুনতে হতো। আমাদের বাড়ির উঠোনেই রাজাকাররা গুলি করে আহত করেছে আকু ভাই আর আরমান চাচাকে। রাজাকার আর খানসেনাদের ভয়ে আমার বাবাকে দেখেছি ঘরের চাতালে বসবাস করতে। কুমারখালী শহরে লুটপাট করতে বাধা দেয়ায় এবং সে দিনই মুক্তিযোদ্ধারা কুমারখালী আক্রমণ করায় তাদের সঙ্গে যোগসূত্র খুঁজে সৈয়দ আহমেদ জামালকে রাজাকার জিন্না, ফিরোজ, সোবহান, সোহরাবরা গুলি করে হত্যা করার পর আমরা সেজ ভাই বিশ্বনাথ দাদের নারকেল বাগানে তার লাশ দেখতে গিয়ে দেখেছি, রাজাকাররা আমার ভাইকেও গুলি করেছে। সে গুলি আমার ভাইয়ের গায়ে না লেগে জামাল সাহেবের স্ত্রীর কপাল ছেঁছড়ে গিয়েছিল। ওই দিন ছোট্ট আমিও ভয়ে সারা দিন আমাদের বাড়ির সামনের পরিত্যক্ত টয়লেটে আত্মগোপন করে থেকেছি। রথযাত্রার রথ ভাঙতে বাঁধা দেয়ায় রাজাকারদের সহযোগিতায় ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী স্বপন ভাইকে ধরে নিয়ে গিয়ে খানসেনারা হত্যা করেছে। আমার মনে আছে, স্বাধীনতার পর কুমারখালী থানা ছাত্র ইউনিয়নের প থেকে পাবলিক লাইব্রেরির সামনের রাস্তাটি আমরা 'শহীদ স্বপন সড়ক' নামকরণ করেছিলাম। অবশ্য নামকরণের দলীয়করণে রাস্তার নাম পরিবর্তন হয়েগেছে। এখন দুঃখ পাই, স্বপন ভাইয়ের ছোট ভাইয়েরা, আমার বন্ধুরা রাজাকারদের সঙ্গেই একত্রে বসেরাজনীতি করেন।

রাজাকার প্রধান মনসুর ডাক্তার আমাদের পাড়ার একটি পরিত্যক্ত দোতলা হিন্দু বাড়ি দখল করে অবস্থান করতো। সে বাড়িটি ছিল রাজাকারদের ঘাঁটি। দিনের বেলায়ও বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে আমরা ভয় পেতাম। তার ছেলেরা সবাই রাজাকার-আলবদর ছিল। পাক হায়েনাদের আনাগোনা ছিল ওই বাড়িতে। প্রায়ই সেই বাড়িটি থেকে মেয়েদের কান্নার শব্দ ভেসে আসতো, গুলির শব্দ শুনতাম প্রতিদিন। চিৎকার, কান্না আর গুলির শব্দে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। কোনো দিন যদি কোনো শব্দ না শুনতাম, তাহলেঅস্বস্তি লাগতো। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের বইয়ের দোকানটি বন্ধ ছিল। দোকানের সামনে আমরা নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর পসরা সাজিয়ে বসতাম। আমাদের পাশের দোকানের ছাদে প্যারা মিলিশিয়া বাহিনীর ক্যাম্প ছিল। প্রায়ই এলাকার যুবক ছেলেদের ধরে এনে নির্যাতন করতে দেখেছি সেখানে। কাউকে কাউকে ব্যস্ত রাস্তার ওপর দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করতো ওরা। মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে এক সন্ধ্যায় ওখানে গেরিলাদের বোমা মারার ঘটনা ঘটতে দেখেছি। পরে শুনেছি, গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা মজনু ভাইদের দল এ হামলা করেছে। মজনু ভাইয়েরা প্রায়ই গেরিলা হামলা করতেন।মুক্তিযুদ্ধে শাহাদত চৌধুরী ছিলেন একজন গেরিলা যোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধে ২ নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডারখালেদ মোশাররফের সঙ্গে তিনি যুদ্ধ করেছেন। তাঁর সঙ্গে দ্বিতীয়বার আমার যখন দেখা হয়, ১৯৮৬ সালের শেষের দিকে, তখন আমি গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে 'মাসিক গণস্বাস্থ্য' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসেবে কাজ শুরু করেছি। তাঁর অনুজ মুক্তিযোদ্ধা ডা. মোরশেদ চৌধুরী তখন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রশিণ সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করতেন এবং সাভার গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে বাসা নিয়ে থাকতেন। একসঙ্গে কাজ করার সুবাদেএবং তাঁর স্ত্রীর বাড়ি কুষ্টিয়া হওয়ার কারণে মোরশেদ ভাইয়ের সঙ্গে আমার একটু বেশি সখ্য হয়েছিল। বিভিন্ন পালাপার্বণে তাঁর বাসায় আমার অবাধ যাতায়াত ছিল। শাহাদত চৌধুরী ছুটির দিনগুলোতে প্রায়ইমোরশেদ ভাইয়ের বাসায় আসতেন, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি আসতেন। বিচিত্রার নিয়মিত পাঠক এবং মুক্তিযুদ্ধের সপ শক্তির একজন সমর্থক হওয়ার কারণে খুব সহজেই তাঁর সঙ্গে আমার

সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে। অবশ্য দ্বিতীয়বারের পরিচয়ের সূত্রপাত করে দিয়েছিলেন মোরশেদ ভাই-ই। বিচিত্রার প্রতিবেদক মাহমুদ শফিক মাসিক গণস্বাস্থ্য পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। পেশাগত কারণে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে আমাকে প্রায়ই বিচিত্রা অফিসে যেতে হতো। বিচিত্রা অফিসে ঢুকলে আমার প্রথম কাজহতো সম্পাদকের চেয়ারে উঁকি দেয়া। আমার দুর্ভাগ্য, আমি কখনোই শাহাদত চৌধুরীকে তাঁর অফিসেএকা বসে থাকতে দেখিনি। দেখেছি, কোনো না কোনো বিশিষ্টজন তাঁর অফিসে বসে আছেন। আর এ কারণেই তাঁর সঙ্গে আমি তাঁর অফিসে বসে কথা বলার কোনো সুযোগ পাইনি। কিন্' গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে এলে তিনি অন্য রকম হয়ে যেতেন। তাঁকে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র চত্বরে দেখলে মনে হতো তিনি যেন নিজের জমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমিও সুযোগ নিয়েছি গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রেই তাঁর সঙ্গে কথা বলার। কখনো মোরশেদ ভাইয়ের বাসায়, কখনো গেট থেকে মোরশেদ ভাইয়ের বাসার পথে হাঁটতে হাঁটতে। শাহাদত ভাই খুব ধীরে হাঁটতেন। তাই কথা বলার সময় পেয়েছি বেশি। এ সময়গুলোর মধ্যেই আমার অনেক কৌতূহল, অনেক অজানা কথা শুনে নিয়েছি তাঁর কাছ থেকে। তিনি শিকের মতো করে বলতেন। গুণমুগ্ধ ছাত্রের মতো আমি শুনতাম। মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আমার আগ্রহ বেশি হওয়ার কারণে, এ বিষয়েই তাঁরকাছে বেশি জিজ্ঞাসা ছিল। তিনিও সম্ভব (আমার নিজের মতো) এ বিষয়ে কথা বলতে বেশি পছন্দ করতেন। ১৯৯১ সালে আমি গণস্বাস্থ্য ছেড়ে অন্য পেশায় যোগ দেই। তারপর অনেক দিন তাঁর সঙ্গে কথা হয়নি। তবে বিচিত্রা আমি ছাড়িনি। বিচিত্রার নিয়মিত পাঠক ছিলাম। সম্ভবত '৯২-৯৩ সালের দিকে শাহরিয়ার কবীর তখন বিচিত্রায় নেই। বিচিত্রায় রাজাকার-আলবদরদের বিরুদ্ধে লেখা হ্রাস পায়। আমার কাছে তখন মনে হয়েছে, বিচিত্রা কি তাঁর চরিত্র বদলাতে শুরু করলো! একজন পাঠক হিসেবে আমার প্রতক্রিয়া জানানোর জন্য আমি সৈয়দপুর থেকে সম্পাদক শাহাদত চৌধুরীকে টেলিফোন করলাম। রিং করতে করতেই আমি প্রশ্ন করে ফেললাম। পুরনো পরিচয় দিয়ে আমি যখন এ প্রশ্ন করলাম, ওপাশ থেকে তিনি হাসলেন। তিনি আমার ব্যক্তিগত খোঁজ-খবর নিলেন। তারপর বললেন, 'আমার মতো বয়স হোক, বুঝতেপারবে।' পরবর্তীতে বুঝতে পেরেছি, যোদ্ধা শাহাদত চৌধুরীর গেরিলা যুদ্ধ তখনো চলছিল। ১৯৯৬ সালে সরকার পরিবর্তনের পর বিচিত্রা বন্ধ হয়ে গেল। আমাদের সামনে নতুন পত্রিকা এলো। সাপ্তাহিক ২০০০। বিচিত্রা যখন বন্ধ হয়, তখনকার বিচিত্রা এবং সাপ্তাহিক ২০০০-এর শুরুর মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। একজন পাঠক হিসেবে আমার মনে হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শত্রুদের বিরুদ্ধে শাহাদত চৌধুরীর নতুনগেরিলা যুদ্ধ এ পত্রিকা ঘিরে আবার শুরু হলো। সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রথম সংখ্যা থেকেই আমি এর পাঠক এবং সংগ্রাহক।

২০০০ সালে আমি আবার গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে ফিরেছি। আবার শাহাদত ভাইয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে, কুশল বিনিময় করেছি। আমি আমার সেই টেলিফোনের কথা বলেছি, উনি হেসেছেন। দু'বছর হলো আমি এই সমুদ্র শহরে বসবাস করছি। তাঁর সঙ্গে গত দু'বছরে একবারও দেখা হয়নি। তবেসাপ্তাহিক ২০০০ আমি ছাড়িনি। পত্রিকার লেখার মধ্যেই আমি মুক্তিযোদ্ধা, গেরিলা যোদ্ধা শাহাদত চৌধুরীর সাাৎ পেয়েছি, পত্রিকার মাধ্যমেই তাঁকে জিজ্ঞাস্য সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি।

চ্যানেল আইয়ে অনুষ্ঠান দেখার পর মোরশেদ ভাইয়ের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করি, তাঁর কাছ থেকে শাহাদত ভাইয়ের অসুস'তার খোঁজ নিই। ২৯ নবেম্বর শাহাদত ভাই যে দিন মারা যান, আমি সে দিনসাভার গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে। আমার মোবাইল ফোন বেজে উঠলো। শফিক ভাই, (শফিক খান, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সিনিয়র নির্বাহী পরিচালক) আমাকে ডাকলেন। তাঁর কাছ থেকে শাহাদত ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ জানলাম। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে তখনই শোকসভা অনুষ্ঠান হলো। ২ নম্বর সেক্টরের নারী মুক্তিযোদ্ধা ইরা করের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ শোকসভায় শফিক খান, সাইফুল ইসলাম শিশিরসহ আমরা স্মৃতিচারণ করলাম। মুক্তিযুদ্ধের ফসল গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নতুন প্রজন্মের কর্মীরা গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অকৃত্রিম বন্ধু শাহাদত চৌধুরীকে চিনলেন, জানলেন তাঁর বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ জয়ের কথা। পরদিন ৩০ নবেম্বর বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহাদত চৌধুরীকে শ্রদ্ধা জানাতে, তাঁর মরদেহে পুষ্পস্তবক দিতে আমরা উপস্থিত হলাম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। শাহাদত চৌধুরী চলে গেলেন। আমরা হারালাম স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াকু এক বীর মুক্তিযোদ্ধাকে, কলম যোদ্ধাকে।

স্মৃতিতে শাহাদত চৌধুরী

সৈয়দ দুলাল

মহান মুক্তিযুদ্ধ আমার চেতনাকে নাড়া দিয়েছে। ৭১-এর কিশোর আমি সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিনি। আমার সেই অক্ষমতাকে আজো ক্ষমা করতে পারিনি। যুদ্ধ শেষে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে যে কোনো লেখালেখি গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়তাম। তখনই জানতে পারি ক্র্যাক প্লাটুন নামে ঢাকা শহরে গেরিলা বাহিনীর বীরত্বগাথা। সেখান থেকেই প্রথম জানি শাহাদত চৌধুরীকে। বাংলাদেশের আধুনিক প্রজন্মের সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক। বিচিত্রার শাহাদত চৌধুরী অনেক বড় মাপের জাতি গঠনের সংগঠক ছিলেন তা আজ প্রতিষ্ঠিত। বিচিত্রার মাধ্যমে বাংলাদেশের বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের পুরনো ধ্যান ধারণা ভেঙে দিয়েছে তিনি। অত্যন্ত সাহসী এই মানুষটি দ্বিধাহীন চিত্তে বলেছিলেন 'খালেদ মোশাররফ ইন্ডিয়ান ছিলেন না।' বিমানের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রচ্ছদ রচনা করেছিলেন টেবিলে বিমান রেখে ডানাসহ অন্যান্য অঙ্গ কাঁটা চামচ দিয়ে উল্লাস করে গিলে খাচ্ছে বিমান মন্ত্রী। আজ এতো বছর পরেও কি আমরা বিমানের সেই অবস্থান থেকে পরিত্রাণ পেয়েছি! রক্তদান, মরণোত্তর চক্ষুদান আন্দোলন জনপ্রিয় করেছে বিচিত্রা। শাহাদত চৌধুরীর নেতৃত্বে বিচিত্রা যে কত বড় বড় সাহসী ভূমিকা

রেখেছিল তা আমাদের প্রজন্ম খুব ভালোভাবে বুঝেছি। আমি মনে করি বিচিত্রা আমার চিন্তা চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছে। আমার মন ও মননে তারুণ্য ও আধুনিকতা এনে দিয়েছে বিচিত্রা। বিচিত্রার শাহাদত চৌধুরীর প্রতি আমার ব্যক্তিগত দুর্বলতা ছিল সীমাহীন। পঞ্চম বর্ষপূর্তি সংখ্যায় শাহাদত ভাইর একটি লেখা ছিল 'আত্মপক্ষ' শিরোনামে। সেই লেখায় তার বিশেষ ভঙ্গিতে একটি ছবি ছিল।

ছবিটি আমার বড় পছন্দ হয়েছিল যে, সেই ৭০ দশকে বরিশালের একটি স্টুডিওতে বিচিত্রা নিয়ে গিয়ে সে রকম একটি ছবি তুলেছিলাম। স্টুডিও মালিক হারুন ভাই সে ছবিটি বড় করে বাঁধাই করে তার দোকানে রেখেছিল অনেক কাল। বিচিত্রার ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন সে সময়ে সারা বাংলাদেশে ব্যাপক আলোড়ন তুলেছিলো। আমরা পাঁচ বন্ধু 'পঞ্চ পান্ডব' নামে লেখা শুরু করেছিলাম। সারা বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে তখন ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন ক্রেজ। প্রতি সংখ্যায় তখন সৃষ্টিশীল ও মানবতাবোধ সম্পন্ন বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি। সে সময় বাংলাদেশে প্রথম মরণোত্তর চক্ষুদান করেন বারডেম-এর প্রতিষ্ঠাতা ডা. ইব্রাহিম। তাঁর দু' চোখের কর্নিয়ার একটি গ্রহণ করেন শাহাদত ভাই। আমরা তখন ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনে চক্ষুদান করার ঘোষণা দেই। এরপরে অনেক বিজ্ঞাপনদাতাই এর পক্ষে লিখতে শুরু করেন। ঠিক এ সময় একজন বিজ্ঞাপনদাতা আমাদের (পঞ্চ পান্ডব) উদ্দেশে চক্ষুদানের বিষয়ে ধর্মীয় ব্যাখ্যা চেয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ একটি বিজ্ঞাপন দেয়। তখন বরিশালে দৈনিক পত্রিকা আসত একদিন পরে লঞ্চে। প্রতি সপ্তাহে বিচিত্রা যেদিন আসত সেদিন খুব ভোরে লঞ্চঘাটে গিয়ে খোঁজ নিতাম বিচিত্রা এসেছে কি না। কোনো কোনো দিন পত্রিকার প্যাকেটের সঙ্গে ফলপট্টি আজমত নিউজ এজেন্সিতে চলে আসতাম। প্যাকেট খুলে বিচিত্রা হাতে নিয়ে স্বস্তি পেতাম। ঠিক এ রকম আবেগঘন দিনে ঐ রকম একটি খোঁচা সহ্য করতে না পেরে অতি সকালে নাস্তা খেয়ে আমরা বসে গেলাম এর উত্তর নিয়ে। লেখাটা ঠিক হলো এ ভাবে 'মানুষের মঙ্গলে ধর্মের প্রর্বতন হয়েছে, ধর্মের প্রয়োজনে মানুষের আগমন হয়নি'। আমরা এতটাই উত্তেজিত ছিলাম যে পরবর্তী সংখ্যায় উত্তরটি ছাপা হাওয়া নিশ্চিত করতে আমি নিজে ঢাকা চলে গেলাম। ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের দায়িত্বে ছিলেন যে ভদ্রলোক তিনি নিশ্চিত করতে পারলেন না চলতি সংখ্যায় ছাপা হবার বিষয়ে। তাই সাহস করে উপরে চলে গেলাম শাহাদত ভাইর কাছে। এই প্রথম তাকে সামনে থেকে আমার দেখা। আমাদের উত্তরটি দেখে শাহাদত ভাই নিশ্চিত করলেন চলতি সংখ্যায় ছাপা হবার। কেন যেন সেদিন তিনি আমাকে পছন্দ করেছিলেন। তারপরে একটানা অনেক বছর বিচিত্রা পরিবারের সঙ্গে পাঠক হিসেবে যুক্ত ছিলাম। বিচিত্রা পাঠক ফোরাম গঠনে কাজ করেছি। কেন্দ্রীয় পরিষদের ৫ জনের মধ্যে ছিলাম। বিভিন্ন জেলায় ফোরাম গঠনে চিন্ময় মৃৎসুদ্দী ও কবি শামসুর রাহমান-এর সঙ্গে গিয়েছি। বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে জরিপ কাজে অংশ নিয়েছি।

আমার জীবনের সবচেয়ে গৌরবজনক অধ্যায় বলে আমি মনে করি একটি কাজ। তা হলো বিচিত্রাই প্রথম বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে অনুসন্ধানী রিপোর্ট করে। সাতজন বীরশ্রেষ্ঠ নিয়ে প্রচ্ছদ রচনা একটি যুগান্তকারী কাজ। '৭৫-এর নৃশংসতার পরে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধারা কোণঠাসা, ঠিক এ সময় বিচিত্রার সিদ্ধান্ত বীরশ্রেষ্ঠদের নিয়ে অনুসন্ধানী প্রচ্ছদ রচনা করার। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে বীরশ্রেষ্ঠদের যত বীরত্বগাথা ও জীবনী প্রকাশিত হচ্ছে তার উপাত্ত সংগ্রহ করেছিলো বিচিত্রা। বরিশালের গর্ব বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের ওপর প্রচ্ছদ রচনা ক্ষেত্রে আমাকেও কিছুটা দায়িত্ব দেয়া হয়। আমি আমার সাধ্যমত কাজ করার চেষ্টা করি। কয়েক দিন পরে চিফ রিপোর্টার কাজী জাওয়াদ বরিশালে আসেন। বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের মা, বোন , মামাসহ স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন জাওয়াদ ভাই। প্রকাশিত সংখ্যায় কাজী জাওয়াদ-এর সঙ্গে আমারও নাম ছিল। আজ বুঝেছি তখন কত সুদূরপ্রসারী চিন্তা থেকে শাহাদত চৌধুরী বিচিত্রা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে নতুন নতুন ভাবনা দিয়ে সমাজ ভেঙেছেন; বিনির্মাণ করেছেন। আমি মনে করি বাংলাদেশের বর্তমান মধ্যবিত্ত পরিবারের মানসিক গঠন ও বিনির্মাণে রেনেসাঁর ভূমিকা পালন করেছে বিচিত্রা ও তার নেতা শাহাদত চৌধুরী।

সহকর্মীদের প্রতি তাঁর অপরিসীম ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ ছিল। একবার বিচিত্রা ফোরাম ক্লাব কেন্দ্রীয় পরিষদের সভায় যোগ দিতে ঢাকা গিয়েছি। বিচিত্রা অফিসে গিয়েই দেখলাম শাহাদত ভাই খুবই উত্তেজিত। ফোনে কাকে যেন বলছে, আগামীকাল হতে হ্যান্ডকাপ অবস্থায় ' দৈনিক বাংলায়' ওর ছবি ছাপা হবে তারপরে আলোচনা। চলচ্চিত্র প্রযোজক ফজলুর রশিদ ঢালী বিচিত্রা প্রতিবেদক মাহমুদ শফিকের গায়ে হাত তুলেছে। সবাই মিলে চলে গেলাম হলিফ্যামিলি হাসপাতালে শফিক ভাইয়ের কাছে। পরের দিন সত্যিই ফজলুর রশিদ ঢালীর সে রকম একটি ছবি দিয়ে ব্যানায় হেড লাইন হয়েছিল। সেনা শাসক এরশাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তি ছিলেন ঢালীর গডফাদার। তাই কেউ ভাবতেই পারেনি। ঢালী গ্রেপ্তার হবে।

বিচিত্রা বন্ধ হবার পরে নতুনভাবে শুরু করলেন সাপ্তাহিক ২০০০। নতুন নাম। কিন্তু ভূমিকা বিচিত্রার মতই চেতনার চাবুক। সারা দিন গাজীপুর ও চট্টগ্রামে অশিক্ষিত জঙ্গিরা মানবতাকে দলিত করেছে। এ জঙ্গিদের বিরুদ্ধে বিগত ১ বছরে ২০০০ যেভাবে একের পর এক অনুসন্ধানী রিপোর্ট করেছে তার যে কোনো একটি রিপোর্টকে আমলে নিয়ে সরকার যদি সাবধান হতেন ব্যবস্থা নিতেন তাহলে আজ ১ ডিসেম্বর আবারও রক্তাক্ত হত না বাংলা। জঙ্গিভীতি সারাদেশকে অচল করে দিতে পারত না।

প্রতি মুহূর্তে আধুনিক চিন্তা চেতনায় শাহাদত চৌধুরীর অসুস্থতার সংবাদ প্রথম আলোর শনিবারের সাময়িকী ছুটির দিনে দেখার পর মনটা খারাপ হয়ে গেল। চলে গেলাম ঢাকা। তাঁর বর্তমান কর্মস্থল সাপ্তাহিক ২০০০ অফিসে গিয়ে বাসার ফোন নম্বর পেলাম। আরিফ খান জানাল, একটি নির্দিষ্ট সময় ছাড়া বলা যাবে না। কয়েকদিন ফোন করে কথা বলতে পারলাম না। নিজের ভিতর একটি অস্থিরতা টের পেলাম। আবার দারস্থ হলাম অরুণ চৌধুরীর কাছে। শর্ত সাপেক্ষে মোবাইল নম্বর পেলাম। যোগাযোগ করলাম কয়েকবার, কিন্তু কথা বলতে পারলাম না। খুব কষ্ট পেয়েছি, আবার এটাও বুঝেছি তাঁর পরিবারের সদস্যরা যা করেছে ঠিক করেছে।

২৯ নবেম্বর গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশানের রজত জয়ন্তী উৎসবে ঢাকা গেলাম। জানলাম শাহাদত ভাই আর নেই। ৩০ নবেম্বর সকাল ১১টার আগেই শহীদ মিনারে পৌঁছে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে কফিনবাহী গাড়িটি এসে থামলো। বাচ্চু ভাই, রামেন্দুদার সঙ্গে এগিয়ে গেলাম কফিনের কাছে। পরিবার সদস্যদের সঙ্গে কাঁধে নিলাম কফিন। শাহাদত ভাইকে বহন করে নিয়ে এলাম নির্দিষ্ট বেদীতে, যেখানে হাজারো মানুষ তাকে শ্রদ্ধা জানাবে অবনত মস্তকে।

কফিনের ডালা খুলে দেয়া হলো। সবাই একনজর দেখছে তাঁকে। না, আমি তার মৃত দেহের মুখ দেখিনি। আজ থেকে তিন দশক আগের সদাহাস্য শাহাদত ভাইর মুখই আমার হৃদয়ে থাকুক। যেই মুখের ভঙ্গিতে আমি আমার ছবি তুলেছিলাম। নিজেকে সাজাতে চেয়েছিলাম তাঁর আদর্শ ও চিন্তায়। সেই মুখটি জাগ্রত থাকুক আমার হৃদয়ে।

সেফওয়ে পেষ্ট